[illegible] :
[illegible]

[illegible]

[illegible] : [illegible]. [illegible]
[illegible]

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

الاستشراق، المصطلح والدلالات

(باللغة البنغالية)

فيصل بن خالد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............. বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রাচ্যবিদ্যা পরিভাষাটি যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যাতে স্থান পেয়েছে খ্যাতনামা মুসলিম চিন্তাবিদদের দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল ও বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য।

প্রাচ্যবিদ্যা : পরিভাষা বিশ্লেষণ

প্রাচ্যবিদ্যা , সন্দেহ নেই যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিস্তৃত ও মোটামুটি জটিল বিষয়। ক্রমশ বিষয়টি নিয়ে আমি বিশদ আলোচনা করব। তবে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে আমাদেরকে, আমি মনে করি, এ সংক্রান্ত পরিভাষাগুলো জানতে হবে। প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে আমরা যদি স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ করতে চাই তাহলে আমাদের জন্য যেটা অপরিহার্য সেটা হচ্ছে শুরুতে প্রাচ্যবিদ্যা এবং তাতে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা লাভ করা। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে তাই আমি الاستشـــــــــراق বা ‘প্রাচ্যবিদ্যা ’ পরিভাষাটি নিয়ে আলোচনা করছি।
পরিভাষার বিষয়টি ব্যাপকভাবে , জ্ঞানগত ও শাস্ত্রীয় যেকোনো ক্ল্যাসিক্যাল আলোচনাতেও অসাধারণ গুরুত্ব পেয়েছে। সমকালীন তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলোও পরিভাষার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। পরিভাষা বিজ্ঞানের বিকাশে

মুসলিম চিন্তার অবদান উল্লেখ করার মতো। ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলো ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, তাতে যেকোনো বিষয়ে লেখা এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা উক্ত গ্রন্থে আলোচিত শাস্ত্রের সংজ্ঞা দিয়ে শুরু হয় না। যেমন, মুসলিম জ্ঞান কাণ্ডের এক সমৃদ্ধ আবিষ্কার মানতেক। এই শাস্ত্রের একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে পরিভাষা, সংজ্ঞায়নের মূলনীতি, পরিগঠন নিয়মাবলি সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা। মানতেক শাস্ত্রকে পরিভাষা বিজ্ঞানের জনক বলা যেতে পারে। ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম লেখকদের অনেক সময় সংজ্ঞা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করতে দেখা যায়। তবে তাদের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে মূল আলোচনায় প্রবেশ করা। সন্দেহ নেই যে, এই ট্রাডিশানের প্রশংসা পাওয়ার অনেক কিছু আছে। কারণ, কোনো শাস্ত্রের পদ্ধতি এবং তাতে ব্যবহৃত পরিভাষা ও মৌলিক শব্দমালা সম্পর্কে কারো যদি সূক্ষ্ম স্পষ্ট ধারণা থাকে তাহলে তার জন্য উক্ত শাস্ত্রে প্রবেশ করা অনেক সহজ হয়ে যায় এবং লেখকও পাঠকদের তার বিষয়বস্তু এবং

লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়ে অনেক অযথা প্রশ্ন থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন।
পরিভাষা নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করার আরেকটি কারণ আছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, পরিভাষা বিকৃতি একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে এবং ক্রমশ তা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। প্রাচ্যের যেসব গবেষক ইসলাম, মুসলিম, মুসলিম চিন্তা নিয়ে কাজ করেছেন এবং তাদের অনেককে দেখা যায় যে, ইসলাম সংক্রান্ত আলোচনায় তারা অনেক সময় বিভিন্ন শব্দ ও পরিভাষার সচেতন এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ বিকৃতি ঘটিয়ে থাকেন। উদাহরণত এ ধারার গবেষকগণ তাদের আলোচনায় অনেক সময় ‘ইসলাম’ শব্দটি ব্যবহার করেন মুসলিম বা নির্দিষ্ট কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠী বুঝানোর জন্য। ‘আমেরিকায় ইসলাম’ ‘মিশরে ইসলাম’ অহরহ আমরা এ ধরনের শিরোনামের বিভিন্ন গ্রন্থ বা নিবন্ধের মুখোমুখী হই। ইসলামের সংজ্ঞা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, সেটা এক জানা ও স্পষ্ট বিষয় অথচ এসব প্রবন্ধে সেই নির্দিষ্ট অভিন্ন ইসলাম সম্পর্কেই আলোচনা করা

হয়েছে। কারণ, একটি নির্ধারিত, অভিন্ন এক নির্ধারিত উৎস অর্থাৎ কুরআনের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠা এক মতাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। স্থানভেদে তার কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এসব আলোচনায় প্রবেশ করলে দেখব ইসলাম নয়, তাতে আলোচনা করা হচ্ছে সেই নির্ধারিত ভূ-ভাগে বসবাসরত নির্দিষ্ট কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠী নিয়ে। ইসলাম আর মুসলিম জনগোষ্ঠী কি এক কথা? এই কালে এসব এলাকার মুসলিমরা কি নিখুঁতভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছেন যে, তাদের নিয়ে আলোচনা করা আর ইসলাম নিয়ে আলোচনা করা একই ব্যাপার? এ শিরোনামগুলোর সঠিক রূপ কি এমন হওয়া দরকার ছিল না, ‘আমেরিকার মুসলিমগণ’ ‘মিশরের মুসলিমগণ’?
‘ইসলাম’ পরিভাষার এই অশুদ্ধ, বিকৃত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তারা যা করতে চান তা হচ্ছে মুসলিমদের জীবন-যাপন, আচার-আচরণকে ইসলাম হিসেবে হাযির করা। উদ্দেশ্য স্পষ্ট: ইসলাম সম্পর্কে অশুদ্ধ নেতিবাচক ধারণা ছড়ানো। কিন্তু, আমরা (তথাকথিক

শিক্ষিতরা) পাশ্চাত্য লেখকদের অনুকরণে নির্দ্বিধায় এই শব্দগুলো ব্যবহার করি, ছাপি , লিখি এবং বেমালুম ভুলে যাই পরিভাষার এই বিকৃত ও অস্পষ্ট ব্যবহার কি ভয়াবহ ফলাফল তৈরি করতে পারে।

পাশ্চাত্যের ইসলাম গবেষকদের পরিভাষা বিকৃতির আরেক উদাহরণ ইসলাম অর্থে Mohammedanism শব্দটির ব্যবহার , আমাদের সম্মানিত গবেষকরা যার অনুবাদ করেন محمدية (মুহাম্মাদিয়া)। বরং অনেক সময় তারা নিজেরাও দীনে ইসলাম অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করেন। কখনো কখনো এই স্থানে তারা الـــدين المحمـــدي (মুহাম্মাদী দীন) শব্দটিও ব্যবহার করে থাকেন। মূলত ইংরেজি Ism শব্দটি ব্যবহার করা হয় কোনো তন্ত্র বা মতবাদকে বুঝানোর জন্য। যেমন, Nationalism قومية (জাতীয়তাবাদ) Secularism علمانية (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ) Communism إشـــتراكية (সমাজতন্ত্র)। এইভাবে ইসলামের ক্ষেত্রে যদি শব্দটি ব্যবহার করা হয় এবং নবী মুহাম্মাদের নামের শেষে Ism যোগ

করা বলা হয় Mohammedanism (মুহাম্মাদীবাদ) তাহলে খুবই সম্ভব যে, ধীরে ধীরে ইসলামের ঐশিত্ব ঘুচে যেতে থাকবে এবং এমন ভুল ধারণা জন্ম নিবে যে , ইসলাম কোনো ঐশী ব্যাপার নয় , তা মূলত এক ঐতিহাসিক ব্যক্তির প্রবর্তিত মতবাদ। আমার এই আশঙ্কা নিশ্চয় অযৌক্তিক নয়। পাশ্চাত্যের লেখকরা এই শব্দটি ব্যবহার করে মূলত তাই করতে চেয়েছেন এবং তার পরিণতি সম্পর্কে অসচেতন থেকে , অনেক সময় ভাল নিয়তে, আমাদের শিক্ষিত লোকেরা-চিন্তা নায়কেরা শব্দটি ব্যবহার করেছেন, করছেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে , যেকোনো গবেষণার সফলতার জন্য, বিশেষত আমাদের এই সময়ে, পরিভাষার বিশ্লেষণ ও স্পষ্টিকরণ একটি অপরিহার্য বিষয়। কোনো শাস্ত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ও সঠিক ধারণা লাভের জন্য সর্বপ্রথম যা দরকার তা হচ্ছে উক্ত শাস্ত্রের পরিভাষাগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট এবং সঠিক ধারণা থাকা। শাস্ত্র আলোচনার এটিই সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

الاستشراق (প্রাচ্যবিদ্যা)

الاستشراق বা প্রাচ্যবিদ্যার সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই এলাকার গবেষকদের মতপার্থক্য রয়েছে। মূলত প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই তারা তার সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে, প্রাচ্যবিদ্যা একটি জ্ঞান - তাত্ত্বিক এবং একাডেমিক বিষয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট এক ধরনের গবেষণা ও তত্ত্ব চর্চার নাম প্রাচ্যবিদ্যা। কেউ কেউ মনে করেন, এটি বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে গড়ে ওঠা একটি পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান। অনেক গবেষকের অভিমত হচ্ছে, এটি একটি প্রাকৃতিক ফেনোমেনা, যার জন্ম প্রাচ্য প্রতীচ্য বা আরো সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্টভাবে বললে ইসলাম ও খৃষ্টবাদের, পরস্পর দ্বন্দ্বের গর্ভে। এখানে আমি প্রাচ্যবিদ্যার কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করছি। এগুলো বিশ্লেষণ করলেই আমরা জানতে পারব এসব সংজ্ঞার নির্ধারকরা প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে কী অবস্থান নিয়েছেন।

• প্রাচ্যবিদ্যা মানে প্রাচ্য জগৎ সম্পর্কিত বিদ্যা। শব্দটি ব্যাপক এবং বিশেষ দুই ধরনের অর্থ দিতে পারে। ব্যাপক অর্থে শব্দটি নিকট-প্রাচ্য-মধ্যপ্রাচ্য-দূরপ্রাচ্য অর্থাৎ প্রাচ্যের যেকোনো স্থান এবং ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম প্রাচ্যের ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ে পাশ্চাত্যের গবেষণা ও তত্ত্বকে বুঝায়। শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে, ইসলামী প্রাচ্য এবং তার ভাষা-ইতিহাস-বিশ্বাস সম্পর্কে পাশ্চাত্যের গবেষকদের গবেষণা ও তত্ত্ব।
• প্রাচ্যবিদ্যা একটি প্রতীচ্যীয় প্রতিষ্ঠান, যা নতুন এক প্রাচ্য গঠন এবং তার ওপর পশ্চিমা আধিপত্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাচ্য নিয়ে কাজ করে।
• বিচ্ছিন্নভাবে প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে পড়াশোনা এবং প্রাচ্যের সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির-মানবীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মাণে যার ভূমিকা অপরিসীম (সাধনা-চর্চা) এই দু’য়ের মাঝে সমন্বয় সাধন। প্রাচ্যবিদ্যা

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর পরস্পর আদান-প্রদানও বটে কিংবা প্রাচ্যবিদ্যা মানে মধ্যযুগীয় সভ্যতার নির্মাণকারী পরিগঠকদের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন।
• প্রাচ্যকে পাঠ, ব্যাখ্যা, পুনর্গঠন এবং তার ওপর আধিপত্য বিস্তারের পশ্চিমা পদ্ধতির নামই হচ্ছে প্রাচ্যবিদ্যা।
• প্রাচ্যবিদ্যা মানে আরব জগৎ, সভ্যতা, ভাষা, সমাজ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ একাডেমিক গবেষক ও অধ্যাপকরা হলেন প্রাচ্যবিদ।
• প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতি যেমন ভারতীয়, পারসিক, চাইনিজ, জাপানী, আরবী এবং তাদের সভ্যতা- সংস্কৃতি-ভাষা-ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে যে সব গবেষক কাজ করেন তাদেরকেই বলা হয় প্রাচ্যবিদ।
• প্রাচ্যবিদ মানে পশ্চিমা গবেষক, যিনি ইসলামী চিন্তা এবং ইসলামী সভ্যতা নিয়ে লেখালেখি করেন। উল্লিখিত সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন ধারার গবেষকদের উক্তিগুলোর প্রতিটিতে যে জিনিসটি হাযির তা হচ্ছে,

প্রাচ্যবিদ্যায় দু ’টি বিষয় থাকবে : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। এর মধ্যে অধিকাংশের মত হচ্ছে প্রাচ্যবিদ্যা একই সাথে জ্ঞান -তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার। প্রাচ্যবিদ্যা মানে ব্যাপকভাবে প্রাচ্যের যেকোনো দেশ ও জাতির সভ্যতা সংস্কৃতি এবং বিশেষভাবে ইসলাম ও আরব সম্পর্কে পশ্চিমের পড়াশোনা , জানা এবং তার মধ্য দিয়ে তার উপর পশ্চিমের রাজনৈতিক আধিপত্যের পথ সুগম ও নিশ্চিত করা। প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে এই ধারণা উনিশ শতক পরবর্তী বিশ্ব -রাজনৈতিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত।
আরবী শব্দ কাঠামো সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা জানেন أ س ت যুক্ত ক্রিয়াপদ মূলত উক্ত ক্রিয়ার কামনা নির্দেশ করে। সুতরাং সেই হিসেবে UI ستشـــــراق শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাচ্যকে কামনা করা। সুতরাং শাব্দিকভাবে শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। প্রাচ্য ভ্রমণ , প্রাচ্য নিয়ে পড়াশোনা (গবেষণা -লেখালেখি করা এবং প্রাচ্য উপনিবেশ গড়া) সবই ইসতেশরাক। আমাদের মনে রাখতে হবে

‘ইসতেশরাক’ নিছক কোনো শব্দ নয়। তা একটি পরিভাষা হয়ে উঠেছে। সুতরাং শব্দটির আভিধানিক অর্থের সাথে সাথে আমাদেরকে নির্দিষ্টভাবে তার পরিভাষিক অর্থও জানতে হবে। প্রাচ্যবিদ্যা শব্দটি প্রথমত এবং মূলত একটি নির্দিষ্ট ভূগোলকে নির্দেশ করে। তবে শব্দের পারিভাষিক ব্যবহারে সেটা বিবেচ্য নয়। তাছাড়া দিকনির্ভর কোনো ভূগোলের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই, নির্ধারকের অবস্থান অনুসারে তা নির্ধারিত হয়। জার্মানে অবস্থিত এক ব্যক্তির নিকট যেটা প্রাচ্য, জাপানে অবস্থানকারীর নিকট সেটা নিশ্চয় প্রাচ্য নয়। সুতরাং শব্দটি বিচার করতে হবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, প্রাচীনকাল থেকে বিশ্ব শক্তি সবসময়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রধানত এই শিবিরে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন রোম-পারস্যের দ্বন্দ্ব, অতঃপর রোম-মুসলিমদের দ্বন্দ্ব, অতঃপর মুসলিম-ক্রুসেডারদের দ্বন্দ্ব, এরপর উসমানী-ইউরোপিয়ানদের দ্বন্দ্ব-ইতিহাসের নানা পর্বে এই দুই শক্তি

বিকশিত হয়েছে এই রূপে। বর্তমান কালে এসে পরস্পর প্রতিপক্ষ এই শিবির ভাগ হয়েছে যেই রূপে তাতে প্রথম শিবির অর্থাৎ পাশ্চাত্যের শিবিরে রয়েছে ইউরোপ আমেরিকা এবং দ্বিতীয় শিবির অর্থাৎ প্রাচ্যে রয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকা।
সুতরাং শব্দটির অর্থ করতে পারি এভাবে: ইসতেশরাক মানে পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রাচ্যকে কামনা করা। অর্থাৎ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের কর্তা হচ্ছে পাশ্চাত্য।
কিন্তু এই সম্পর্কের ধরণ কী এবং সম্পর্ক পাতানোর ক্ষেত্রে কর্তার মনে কী আকাঙ্ক্ষা কাজ করে? প্রাচ্যবিদ্যাকে যারা একাডেমিক, জ্ঞান-তাত্ত্বিক জায়গা থেকে বিচার করেন তারা বলেন, পশ্চিমা পণ্ডিতদের প্রাচ্য পাঠ, প্রাচ্যকে জানা, প্রাচ্যের ইতিহাস-সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার নামই প্রাচ্যবিদ্যা। আর যারা বিষয়টি বিচার করেন রাজনৈতিক জায়গা থেকে তারা বলেন, প্রাচ্যবিদ্যা মানে জ্ঞানগতভাবে পশ্চিমের প্রাচ্যকে আত্মস্থ করণ

এবং তার মধ্য দিয়ে তার ওপর আধিপত্ব বিস্তার।
আমি মনে করি প্রাচ্যবিদদের প্রাচ্য নিয়ে কাজগুলো আমাদেরকে প্রাচ্যবিদ্যা বুঝতে সহযোগিতা করতে পারে। প্রাচ্যবিদদের কর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তারা সমগ্র প্রাচ্য নয়, সর্বাধিক মনোযোগ দিয়েছেন প্রাচ্যের একটি বিষয়ের দিকে, সেটা হচ্ছে আরব এবং ইসলাম। প্রাচ্যবিদ্যার এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই কোনো কোনো গবেষক প্রাচ্যবিদ্যাকে দু’ভাগে ভাগ করেছেন: ব্যাপক এবং বিশেষ। ব্যাপক প্রাচ্যবিদ্যা কাজ করে ব্যাপকভাবে প্রাচ্যের সভ্যতা-সমাজ-সংস্কৃতি- ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-সমাজ-অর্থনীতি নিয়ে। আর বিশেষ প্রাচ্যবিদ্যা কাজ করে প্রাচ্যের একটি বিশেষ অংশ অর্থাৎ আরব সভ্যতা ও ইসলাম নিয়ে। পরবর্তীতে আমরা দেখব এই বিশেষ প্রাচ্যবিদ্যা নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।
আরব সভ্যতা ও ইসলাম নিয়ে প্রাচ্যবিদদের লেখা-গবেষণাগুলো পড়লে দেখা যায়, নিছক জ্ঞান অর্জনের

আগ্রহে বা অন্য কোনো সদিচ্ছা নিয়ে তারা ইসলাম নিয়ে কাজ করেন নি। মূলত এই প্রাচ্যবিদরা শুরুতেই আরব সভ্যতা ও ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব নিয়েই কাজ শুরু করেন এবং সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন দিক থেকে তার বিরুদ্ধে কাজ করেন। বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল বিকৃত ধারণাগুলোর অধিকাংশের জন্ম এই প্রাচ্যবিদ্যার গর্ভে। ধর্ম সচেতন মুসলিমরা যে প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছেন তার উৎস এই দুঃখজনক বাস্তবতা। বিভিন্ন মুসলিম দেশে জাগ্রত নানা ইসলামী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যখন ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক নতুন প্রজন্মের বিকাশ ঘটল তখন মুসলিম সমাজে প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে এই নেতিবাচক ধারণা আরো সচেতন ও সংঘটিত বিকাশ লাভ করে। এই প্রজন্ম প্রাচ্যবিদ্যার চরিত্র, প্রাচ্যবিদদের লক্ষ্য এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের লেখা গ্রন্থ পাঠের বিপদ সম্পর্কে মুসলিম

সমাজকে সচেতন করে তুললেন। ফলে ইসলামী বিশ্বে প্রাচ্যবিদ্যা গ্রহণযোগ্যতা হারাল। ‘প্রাচ্যবিদ্যা’ ও ‘প্রাচ্যবিদ’ শব্দগুলো পরিণত হলো ঘৃণ্যতম শব্দে। এই সময়েই আমরা দেখতে পাই যে, পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম নতুন দু’টি শব্দ তৈরি করল, ‘মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা’ ‘মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ’। আরব, ইসলাম নিয়ে গবেষণা হয়ে উঠল ‘মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা’ এই বিষয়ের পশ্চিমা গবেষক, ‘প্রাচ্যবিদ’ বাদ দিয়ে নতুন নাম গ্রহণ করলেন ‘মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ’। বলাবাহুল্য প্রাচ্যবিদ্যার বিষয় ও লক্ষ্য কিন্তু অভিন্নই থাকল; বদলে গেল শুধু তার নাম। ‘প্রাচ্যবিদ্যা’ ও ‘মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা’ মূল স্বভাবে এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যে একই বস্তু। ‘মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা’ নতুন এই পরিভাষাটির উদ্ভব ঘটে পঞ্চাশের দশকের পর থেকে। শব্দটি জন্মদাতা যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়াগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠনই পরিকল্পিতভাবে তৈরি করে বিভিন্ন বিষয়ের ‘মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞদের’।

‘প্রাচ্যবিদ ’ শব্দটির সর্বপ্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় , প্রাচ্যের এক চার্চ সদস্যের ক্ষেত্রে ১৬৩০ সালে। এরপর ১৬৯০ এ স্যামুয়েল ক্লার্ক প্রাচ্যের কয়েকটি ভাষা শিখে ‘প্রাচ্যবিদ ’ হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেন।

শব্দটি ইংরেজি ডিকশনারিতে প্রবেশ করে ১৭৭৯ সালে। ফরাসী একাডেমির শব্দকোষে ঢুকে ১৮৩৮ সালে।

الاســــــتغراب والمســــــتغرب
(পাশ্চাত্যবিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিদ)

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হতে পারে الاستشـــراق (প্রাচ্যবিদ্যা)-এর মতো الاســـتغراب (পাশ্চাত্যবিদ্যা) বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে? শাব্দিকভাবে অবশ্যই আছে। الاستشراق এর বিপরীত শব্দ হতে পারে الاستغراب (ইস্তেগরাব)। الاستشراق এর মানে যদি হয় প্রাচ্যের ইতিহাস -সভ্যতা -সাহিত্য -সংস্কৃতি ধর্ম নিয়ে প্রতীচ্যীয় গবেষণা তাহলে তার বিপরীত শব্দ হবে الاستغراب যার মানে হবে পাশ্চাত্যের ইতিহাস -সভ্যতা -ভাষা -সাহিত্য -সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাচ্যীয় গবেষণা। সুতরাং

পাশ্চাত্যের যে গবেষক প্রাচ্য নিয়ে গবেষণা করেন তাকে যেমন مستشرق বা প্রাচ্যবিদ বলা হয়, তেমনিভাবে পাশ্চাত্য নিয়ে গবেষককে مستغرب বা পাশ্চাত্যবিদ বলা হবে।

তবে পাশ্চাত্যবিদ্যার অস্তিত্ব নিছকই শাব্দিক। বাস্তব ফেনোমেনা হিসেবে পাশ্চাত্যবিদ্যার কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রাচ্যের চিন্তা-নৈতিক জীবনে আজ অবধি এমন কিছু গড়ে উঠে নি যা জ্ঞান-তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রাচ্যবিদ্যার মোকাবেলা করতে সক্ষম। প্রাচ্যের চিন্তাবিদদের অনেকের মধ্যে এই পরাজয়ের অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, প্রাচ্যের এক চিন্তাবিদের হাতাশা ভরা স্বীকারোক্তি: ‘তারা যেভাবে প্রাচ্যবিদ্যা গড়ে তুলেছে আমরাও যদি সেরকম সমৃদ্ধ কোনো পাশ্চাত্যবিদ্যা গড়ে তুলতে পারতাম, পাশ্চাত্যের চিন্তা-নৈতিক ও জ্ঞান-তাত্ত্বিক যাবতীয় ইতিবাচক উদ্ভাবন আবিস্কারকে আত্মস্থ করে তার আরবী ভাষান্তর করে ফেলতাম তাহলে অবশ্যই আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতি-শিল্পের সাথে তাল রেখে

আমরা এতদিনে সার্থক এক আরবীয় রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটাতে পারতাম।’ ইতিবাচক পাশ্চাত্যবিদ্যার অস্তিত্ব নিছকই শাব্দিক হলেও প্রাচ্যে নেতিবাচক পাশ্চাত্যীয়তার অস্তিত্ব শোকাবহভাবে জীবন্ত। এবং নেতিবাচক এই ইস্তেগরাব গড়ে উঠেছে প্রাচ্যবিদ্যার প্রভাবেই। প্রাচ্যবিদ্যার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক সময় প্রাচ্যের লোকদের সামনে প্রাশ্চাত্যের আধিপত্য যখন জীবন্ত হয়ে হাযির হয় তখন তার সামনে প্রাচ্যের লোকেরা এক ধরনের মানসিক বিপর্যয়বোধ করেন। তারা তখন পাশ্চাত্যকে অনুকরণ শুরু করেন স্থূলভাবে (সাধারণ জীবনযাপন পদ্ধতিতে, পোশাক-আশাক-খাওয়া-দাওয়া- চলা-ফেরার ঢঙে) সাধারণ সংস্কৃতিতে। এভাবে এক সময় পাশ্চাত্যের জীবন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ঢুকে পড়ে প্রাচ্যের মূল ধারার জীবনে। এবং ইতিবাচক কোনো পাশ্চাত্যবিদ্যা গড়ে পাশ্চাত্যকে আত্মস্থ না করে আমরা এক শোকাবহ পাশ্চাত্যীয়তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি, মেতে উঠি

(সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে) পাশ্চাত্যের অন্ধ এবং স্থূল অনুকরণে।

الاســـتعراب و المســـتعرب (আরববিদ্যা এবং আরববিদ)

الاســــتعراب বা আরববিদ্যা মূলত প্রাচ্যবিদ্যারই একটি শাখা। প্রাচ্যবিদ্যার শেষ পর্বে প্রাচ্যবিদরা যখন প্রাচ্যের একটি অংশ আরব ও আরবীয় সভ্যতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ বিশেষভাবে শুধু আরব নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তখনই এই পরিভাষাটি গড়ে উঠে। সুতরাং মুস্তারিব বা আরববিদ মানে বিশেষভাবে আরব সভ্যতা -ভাষা -সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণাকারী পশ্চিমা গবেষক। তবে শব্দটি কখনো কখনো আরেকটু ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তখন শব্দটি আরবীয় সভ্যতা -সংস্কৃতি -আরবীয় চিন্তা -দর্শন -ভাষা -সাহিত্যের যেকোনো গবেষককেই (তিনি পাশ্চাত্যের হন বা প্রাচ্যের) নির্দেশ করে। সেই অর্থে কোনো জাপানী যদি আরবীয় সভ্যতা -সংস্কৃতি -চিন্তা -দর্শন নিয়ে গবেষণা করেন তাহলে তাকে মুস্তারিব বলা যাবে। তবে তাকে মুস্তাশরিক বা প্রাচ্যবিদ বলা যাবে না। কারণ , ভৌগোলিক বিচারে তিনি প্রাচ্যের।

তবে প্রাচ্যবিদ্যার ব্যাপক যে সংজ্ঞা (যাতে প্রধান বিচার্যের বিষয় ধর্ম) সেই অনুসারে খ্রিস্টান জাপানী মুস্তারিবকে মুস্তাশরিকও বলা যাবে।
ইউরোপের আরবী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস অনেক দিনের। ইউরোপিয়ানদের আরব চর্চার প্রবণতার সবচেয়ে তীব্র কাল ১১০০-১৫০০, স্পেনে যখন সমৃদ্ধ এক আরবীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। ইউরোপের ইতিহাসে এই কালটি ‘আরবীয় ইউরোপ’ নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ সময় যা কিছু আরবীয়, ইউরোপের যুবক শিক্ষার্থীরা তার প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তখনকার এক খ্রিস্টান ধর্মযাজকের এক জবানিতে তা ফুটে উঠেছে এভাবে:
‘আমাদের ধর্মীয় ভাইরা আরবী কবিতা ও রূপকথা খুব উপভোগ করেন। ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে তারা মুসলিম দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের রচনা পড়েন। কেন? তার সমালোচনা করার জন্য! হায় কপাল!! তারা এসব দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের রচনা পড়েন তার বিশুদ্ধ সুন্দর আরবী শৈলী রপ্ত

করার জন্য। এখন তুমি গির্জার লোকদের ছাড়া এমন একজন খ্রিস্টানও পাবে না যে ব্যক্তি পবিত্র গ্রন্থের ল্যাটিন ব্যাখ্যাগুলো পড়ে, তারা ছাড়া কেউই এখন আর প্রফেট এবং তার হাওয়ারীদের কাহিনীগুলো পড়ে না। হায় কপাল! খৃস্টান মেধাবী যুবকরা এখন আরবী ভাষা সাহিত্য নিয়ে মেতে আছে, তারা তা খুব পছন্দ করে, মনোযোগ দিয়ে তা অধ্যয়ন করে। আরবী বই পুস্তকের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এবং সর্বত্র স্পষ্ট বলে বেড়ায় আরবী ভাষা-সাহিত্য আসলেই খুব মুগ্ধকর ব্যাপার। তাদেরকে যদি খৃস্টীয় পবিত্র গ্রন্থগুলোর কথা বল তাহলে তারা খোলাখুলি বলবে এগুলো তাদের মনোযোগ পাবার যোগ্য নয়। হায় ঈশ্বর!! খ্রিস্টানরা তাদের নিজেদের ভাষা পর্যন্ত ভুলে গেছে। হাজারেও তুমি এমন একজন পাবে না যে নিজে নির্ভুল একটি চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারে। পক্ষান্তরে আরবী লেখা? তুমি এমন অসংখ্য খ্রিস্টান পাবে যারা বিশুদ্ধ এবং খুবই মান সম্মত আরবী লিখতে সক্ষম; বরং এখন তারা আরবী কবিতাও লিখছে এবং তাদের অনেকের

কবিতা শিল্প-সাহিত্যের বিচারে, স্বয়ং আরবদের কবিতার চেয়ে অনেক ভালো।’
এই হলো ইতিহাস- ইউরোপের ইস্তেরাবের। কিন্তু বর্তমান হচ্ছে আমাদের ইস্তেগরাব। আমাদের শিক্ষিত ও তথাকথিত সংস্কৃতিমনা লোকজন অনারবীয় ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করেন, অনারব সাহিত্য উপভোগ করেন, ইংরেজি- ফরাসী পত্র-পত্রিকা পড়েন সব সময়, অনায়াসে। তবে তাদের অধিকাংশরই অবস্থা হচ্ছে তারা নির্ভুলভাবে এক পৃষ্ঠা আরবী পড়তে সক্ষম নন। অবশেষে পাশ্চাত্যের কয়েকজন মুস্তারিব বা আরববিদের নাম উল্লেখ করে রাখি: ইতালির উমবারটো রিজিটানো, তিনি বেলেরমু বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। স্পেনের গার্সিয়া গোমেজ এবং আরবী ভাষা ও আঞ্চলিক আরবী ভাষার বিশেষজ্ঞ জার্মান গবেষক ফিশার।

সমাপ্ত